BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 62-79

বাংলা ও অসমিয়া উপন্যাসে গ্রামজীবনের প্রতিফলন : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত
ই-মেইল : brjsanjay24x7@gmail.com

সারসংক্ষেপ

উপন্যাস সাধারণত মানবজীবনের আধারে রচিত হয়ে থাকে। যাপিত জীবনের নানা আলেখ্য চিত্রিত হয় উপন্যাসের পাতায়। মানুষ সামাজিক জীব। মানবসমাজের যে বিন্যাস আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি তা মূলত গ্রামভিত্তিক অথবা শহরকেন্দ্রিক। স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসেও এই জনজীবনই উপস্থাপন করা হয়। বাংলা ও অসমিয়া কথাসাহিত্যে এমন বহু উপন্যাস রয়েছে যেখানে গ্রামীণ জীবনের কথা বলা হয়েছে। এরকমই দুটি উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' ও সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'। দুটি উপন্যাসেরই কেন্দ্রে রয়েছে দুই গ্রাম। 'ইছামতী'তে পাঁচপোতা গ্রাম এবং 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন'তে ডালিম গ্রাম। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রে আমরা এই দুই গ্রামের জনজীবনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ জনপদের স্বরূপ বুঝে নিতে প্রয়াস করবো।

বীজ শব্দ

গ্রামজীবন, কথাসাহিত্য, ইছামতী, সূরুযমুখীর স্বপ্ন, তুলনামূলক আলোচনা, ভারতীয় প্রেক্ষাপট

ভূমিকা

সাধারণত উপন্যাসের আধেয় হয় মানুষ এবং তার বসবাস করা সমাজ। আর এই সমাজ সাধারণত গ্রামকেন্দ্রিক অথবা শহরভিত্তিক। বিশ্বের সমস্ত ভাষাতেই গ্রাম অথবা শহরকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচিত হয়েছে। ভারতীয় ভাষাগুলোতে রচিত উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা উপন্যাসে নিশ্চিন্দিপুর বা কেতুপুর কিংবা বাঁশবাদী গ্রাম তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অমর হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অসমিয়া উপন্যাসেও আমরা পাই ডালিম, মহঘুলি প্রভৃতি গ্রামের প্রসঙ্গ। আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' ও সৈয়দ আব্দুল মালিকের 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসে প্রতিফলিত গ্রামজীবনের একটা তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্য

তুলনামূলক সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ। একাধিক ভাষা বা সাহিত্য বা দেশ বা জনগোষ্ঠী কিংবা সাহিত্য-সমাজের পারস্পরিক তুলনা করে আলোচকেরা যে আলোচনা করেন, তাকে মোটামুটিভাবে এই শ্রেণিতে ফেলা যেতে পারে। এখানে বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যে রচিত দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় পাশাপাশি দুই অঞ্চলের দুটি ভাষায় লেখা দুরকম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিল ও পার্থক্য দেখিয়ে সাহিত্য যে আসলে দেশকাল নিরপেক্ষভাবে মানুষের কথা বলে থাকে, এটি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

সাহিত্যিক প্রকাশনা

বাংলা ভাষায় এরকম কোনো লেখা এই প্রথম। অসমিয়া ভাষায় 'বিভূতিভূষণ ও মালিক' বলে একটি গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু সেখানে এই দুজন লেখকের সার্বিক লেখালেখি নিয়ে আলোচনাই মূল। গ্রাম জীবন নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা কোনো গ্রন্থ বা অন্য কোনো লেখা নেই।

পদ্ধতি

এই আলোচনায় মূলত বর্ণনাত্মক ও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেন, তখন থেকেই তাঁর মনে একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল এই উপন্যাসের স্থান-কাল-পাত্র-সম্পর্কে। এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তার দিনলিপিগুলোতে বিভূতিভূষণ সেই পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছেন বহুবার।

তাঁর দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা'য় তিনি লিখেছেন,

> "... কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম- ওই আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী।... গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দফুল । ... স্নিগ্ধ পাটা শ্যাওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে। ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসি কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল-কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হলো ওই ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই। ওই বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্মে বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকুন্দ ফুল, ওই পাটা শেওলা, বনঝোপ ছাতিম বন।
>
> এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।"[১]

'উৎকর্ণ' তে লিখেছেন,

> "এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায় - ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে- কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি

> কান্না প্রেম-বিরহ-এইরকম চলবে। এদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব আজ মাথায় এসেছে....মহাকাল যেন উপন্যাসের পটভূমি– নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নর-নারী । Da-Vinci-র শেষ জীবনের মতো গভীর তার আকুতি।"[২]

'হে অরণ্য কথা কও'-তে লিখেছেন, "ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো, নাম দেবো তার ইছামতী। বড় উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব জীবন প্রবাহের ইতিহাস-বন নিকুঞ্জের মরা-বাঁচার ইতিহাস। কত সূর্যোদয়। কত সূর্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন শান্ত ইতিহাস।"[৩]

অতএব একথা বেশ জোর দিয়ে বলা যায় যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে সমাজের যে দিকটার কথা তুলে ধরা হয়েছে তা ইছামতী নদী সন্নিহিত অঞ্চলের সমাজ এবং তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যগুলি ধরে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তবে আরও পরিষ্কারভাবে যে কথাটি পরিস্ফুট হয় তা হলো, সেই নদী তীরবর্তী গ্রাম সমাজের কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। লক্ষ্য স্থির করে ইছামতী তীরের যে গ্রামটিকে তিনি উপন্যাসের স্থান হিসাবে নির্বাচন করলেন, তার নাম পাঁচপোতা। স্মরণযোগ্য যে, ইছামতী উপন্যাসে যে সময়ের কথা আছে সেই সময় বেশ দীর্ঘ, প্রায় ৬০-৭০ বছর। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী বা সমসাময়িক নীলকরদের প্রসঙ্গ রয়েছে উপন্যাসের প্রথম দিকে। শেষের দিকে চাকদা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত রেল লাইনের কথা আছে। অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কুড়ি শতকের প্রথমার্ধে অনেকটা সময় ধরে শতকের ঘন্টা সময় ধরে চলেছে এই উপন্যাসের কাহিনীর ধারা। বাংলা তথা ভারত সেই সময় ইংরেজ শাসনাধীন। ফলে ঔপনিবেশিক বাংলার, বিশেষত গ্রামবাংলার জীবনাচরণের একটা স্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। যদিও যশোর ২৪ পরগণা জেলার এক প্রান্তীয় অঞ্চলের জনজীবন উপন্যাসের আলোচ্য, তবুও সেই অর্থে একে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না। কিন্তু একথাও কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে,

> "একটি বিশেষ অঞ্চলের মানবজীবনের সুখ-দুঃখের নানা বৈচিত্র্য প্রকৃতির পটভূমিতে চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করেছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, সমাজ জীবনের চিত্র, প্রকৃতি-বৈচিত্র্য প্রভৃতি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এখানে যে কয়েকটি ব্যক্তি চরিত্রের বিকাশ ঘটেছে, তাদের মধ্যে ঐ অঞ্চল-জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে তাদের চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।"[৪]

যে সমাজের কথা 'ইছামতী' উপন্যাসে আছে সেটি মূলত গ্রামীণ ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ। সেই সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেকটাই ইংরেজ নীলকর সাহেবদের দখলে। নীলকরদের অত্যাচার কিংবা তাদের অধীনস্ত কর্মচারীদের জুলুমবাজি, হত্যা, ঘরে আগুন লাগানো, কৃষিজমি জবরদখল ছিল তখনকার স্বাভাবিক ঘটনা। দীনবন্ধু মিত্র লিখিত 'নীলদর্পণ' নাটকেও এমন কথা আছে। নীলকুঠির বাইরের যে সাধারণ জনসমাজ, সেটাও অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কৌলিন্য প্রথা, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট। সমাজ শিরোমণি ব্রাহ্মণেরাও বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দলাদলিতে ব্যস্ত। সামাজিক নিম্নশ্রেণির লোকেরা বেশিরভাগ দারিদ্র্য কবলিত এবং উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত। তাদের স্থান সমাজে থাকলেও নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। ইছামতীর তীরে মানবজীবনের

সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বয়ে চলেছে নদীর জলধারার মতো। উপন্যাসে দেখি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সহ্য করতে করতে একসময় প্রজারা বিদ্রোহ করে, কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে নীলকুঠির দিন ক্রমাগত শেষ হয়ে আসে। এদিকে সাধারণ ব্রাহ্মণ্য শাসিত গ্রামসমাজেও কৌলিন্য প্রথা, গ্রাম্য সংস্কার, সংকীর্ণ সমাজজীবনের অন্ধকারে চকিতে উদ্ভাসিত হয় মানবতার ক্ষীণ আলোক। তথাকথিত নিম্নশ্রেণির নর-নারীর মধ্যে যেমন এখানে দেখি অকৃত্রিম মমতার পরশ, তেমনি দুর্ধর্ষ ডাকাতের মধ্যেও দেখা যায় সরল মানুষকে।[৫]

শুধু তাই নয় কোনো নিম্নবর্গের ব্যক্তি ব্যবসা করে ক্রমশ ধনী হয়ে গোটা সমাজের ঈর্ষার কারণ ও সম্মানের পদে আসীন হয়ে যায়। উপন্যাসে সমকালীন জীবনযাত্রার এই ঘটনাগুলি সযত্নে চিত্রিত হয়েছে।

ইছামতী উপন্যাসের সমাজজীবন মূলত মোল্লাহাটের নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নীলকুঠি শাসিত সমাজের উপর বড়সাহেব শিপটন ও ছোট সাহেব ডেভিড এবং তাদের দেওয়ান রাজারাম রায়ের অত্যাচারের দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন বিভূতিভূষণ। রামকানাই কবিরাজের মতো নিরীহ লোককে তারা যেভাবে হেনস্থা করেছে তা পাঠকের কাছে তৎকালীন সমাজের এক জ্বলন্ত বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। সেটি ঔপনিবেশিক প্রভুদের এই অত্যাচারের চিত্র। তাদের অত্যাচারের বাহন ছিল তাদেরই তৈরি ভারতীয় বৃত্ত। তাই প্রসন্ন আমিন বা রাজারাম রায় বা নফর মুচির কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না, বৃদ্ধ, অসহায়, শীর্ণ রামকানাই এর উপর অত্যাচারের। রামকানাই ও নফর মুচির কথোপকথন এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যায়-

রামকানাই- "আমারে মেরো না বাবা। আমার বাত শ্লেষ্মার অসুখ আছে। আমি তাহলে মরি যাব।"

নফর- "মরে যাও বাঁওড়ের জলে ভাসিয়ে দেবানি। তার জন্যে ভাবতি হবে না। অমন কত এ হাতে ভাসিয়ে দিইচি।"[৬]

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিধ্বস্ত ও প্রধানত নীলকুঠি নির্ভর গ্রামীণ সমাজে কর্মসংস্কৃতির ছিলনা কোনো বালাই। তাই সকাল-সন্ধ্যা গৃহস্থের আঙিনায় চণ্ডীমণ্ডপে বসতো দাবা ও পাশা খেলার আসর। সেযুগে চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া পল্লীবাংলার সমাজজীবন কল্পনা করাও যায় না, তারাশংকরও তাঁর উপন্যাসে চণ্ডীমণ্ডপের কথা উল্লেখ করেছেন। এই চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর যোগ থাকলেও আসলে এটা হচ্ছে অলস ও কর্মহীন লোকের আড্ডার জায়গা। বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' উপন্যাসে চণ্ডীমণ্ডপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক পরিষ্কাররূপে দৃশ্যমান হয় এবং সেই অঞ্চলের জীবনচর্যার প্রাণস্পন্দনটি অনুভব করা যায়। ঔপন্যাসিক এর বর্ণনাও সুন্দর দিয়েছেন–

> "চণ্ডীমণ্ডপ হচ্ছে পল্লী গ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এসব পাড়াগাঁয়ে আদৌ নেই,

ওটা বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চালে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারা দিনে অন্তত আধসের তামাক জোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই । গ্রামের মধ্যে চন্দ্র চাটুজ্জে, ফণি চক্কোত্তি ও মহাদেব মুখুজ্যের চণ্ডীমণ্ডপই প্রথম শ্রেণির প্রতিষ্ঠান। রাজারাম রায় যদিও সম্পন্ন গৃহস্থ, তিনি নীলকুঠির কাজে অধিকাংশ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকেন। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা বসে না।

এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবন-সংগ্রামে এদের অজ্ঞতা, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম কাঁঠালের বাগান আছে, লাউ কুমড়ার মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে দুমাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় "বাখারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাখারির দাগ গুনে মাসকাবারি দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা সেখানে অবকাশযাপনের এইসব অলস ধারাই লোকে বেছে নিয়েছে। আলস্য ও নৈষ্কর্ম থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ। পল্লীবাংলার জীবন ধারার মধ্যে শ্যাওলার দাম আর ঝাঁজি জমে ওঠে জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কলকল্লোল নেই, নেই তার নিজের কক্ষপথে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি।"[৭]

বুঝতে অসুবিধা হয় না, উনিশ শতকের উত্তরার্ধের প্রথমদিকে অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা গ্রাম্য জীবনের শীর্ষস্তরে এমন এক কর্মহীনতা এনেছিল যার ফলে সমাজ নিমজ্জিত হয়েছিল অধিকতর অন্ধকারে। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল এর। নালু পাল ও সতীশ কলুর মতো তথাকথিত নিম্নবর্ণের দুটি লোক শুধুমাত্র কঠিন শ্রম ও বুদ্ধিমাত্র সম্বল করে চরম দারিদ্র্য থেকে ক্রমে সমাজের একজন ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়, তা দেখিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের প্রথমেই মামার বাড়িতে আশ্রিত ও মামির গঞ্জনায় ব্যথিত নালু পালকে দেখি মোল্লাহাটির হাটে যাচ্ছে পান সুপারির মোট মাথায় করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই নালু পালই হয়ে ওঠে লালমোহন পাল। গ্রামের তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে সে তীর্থ যাত্রার পূর্বে এবং তীর্থভ্রমণের শেষে পর্যাপ্ত ফলাহারের আয়োজন করে। এই আয়োজন উপলক্ষে সেই সময়কার গ্রাম্য সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটের চিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখানে–

"নালু গড় হয়ে সবাইকে একসঙ্গে প্রণাম করে জোড় হাতে বললে- আমার একটা আবদার আছে আপনাদের রাখতি হবে। আপনারা নাকি তীথ্থি যাচ্ছেন শোনলাম। একদিন আমি ব্রাহ্মণ তীথ্থযাত্রী ভোজন করাবো। আমার বড় সাধ। এখন আপনারা অনুমতি দিন, আমি জিনিস পাঠিয়ে দেবো চক্কোত্তি মহাশয় এর বাড়ি। কি কি পাঠাবো হুকুম করেন।

... চন্দ্র চাটুজ্জে বললেন- কি ফলার করাবে?

নালু হাতজোড় করে বল্লে- আজ্ঞে, যা হুকুম।

–আধ মন সরুচিড়ে, দই, খাঁড়গুড়, ফেনি বাতাসা, কলা, আখ, মঠ আর –ফণি চক্কোত্তি বললেন- মুড়কি ।

–মুড়কি কত?

–১০ সের

–মঠ কত?

–আড়াই সের দিও কেষ্ট ময়রা ভালো মঠ তৈরি করে, ওকে আমাদের নাম করে বলো। শক্ত দেখে কড়া পাকের মঠ করে দিলে ফলারের সঙ্গে ভালো লাগবে ।

চন্দ্র চাটুজ্জে বললেন- দক্ষিণে কত দেবে ঠিক কর।

.....

ফণি চক্কোত্তি বললেন –এক সিকি করে দিও আর কি!

নালু বললে– 'বড্ড বেশি হয়েছে কর্তা। মরে যাবো। বিশজন ব্রাহ্মণকে বিশ সিকি দিতি হলি'..."[৮] ।

যশোর অঞ্চলের ভাষায় এই কথোপকথন এখানে নিয়ে এসেছে আঞ্চলিকতার পরশ। অবশ্য আঞ্চলিকতার এই প্রভাব সামাজিক জীবনধারার উপরেও দেখা যায়। এখানকার স্থানীয় লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে প্রভাবিত হয় বিলাতি সাহেবেরাও। যেসব সাহেব নীল চাষ করতে বাংলাদেশের গ্রামে এসে অনেকদিন ধরে বসবাস করেছে, তাদের জীবনযাত্রায় পড়েছে এই অঞ্চলের গভীর ছাপ। বিভূতিভূষণ খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন একথা –

> "সাহেবেরা ছোট-হাজারী খেলে বড় অদ্ভুত ধরনের। এক এক কাঁসি পান্তাভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাতের টেবিলের ঠান্ডা হ্যাম। একটা করে আস্ত শসা জন পিছু। চার-পাঁচটা করে খয়রা মাছ সরষের তেলে ভাজা। বহুদিন বাংলাদেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরই আহার বিহার এদেশের গ্রাম্য লোকের মত হয়ে গিয়েছে। ওরা আম কাঁঠালের রস দিয়ে ভাত খায়। অনেকে হুঁকোয় তামাক খায়। নিম্নশ্রেণির মেয়েদের সঙ্গে মেশে, অনেককে ঘরেও রাখে।"[৯]

তবে বিদেশি সাহেবেরা সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় নি। যখন বিদেশ থেকে অতিথি আসে বা আসে কোনো স্বজাতীয় উচ্চপদস্থ অফিসার, তখন ভেড়ার মাংস, মাছ, আম কিংবা ঘি সংগ্রহ করা হয়। শুধু তাই নয়, মদের আসরেরও আয়োজন হয়। ভেড়ার মাংসের সঙ্গে বাচ্চা শুয়োরের মাংস তাদের খুব পছন্দ।

'ইছামতী'তে বেশ কয়েকটি উৎসবের কথা আছে। উৎসবের মধ্যে কয়েকটি যেমন– অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, তীর্থযাত্রীদের জন্য ভোজের আয়োজন, দুর্গাপূজা, 'তেরের পালুনি' প্রভৃতি।

'তেরের পালুনি' হয় ভাদ্র মাসের তের তারিখ। সমগ্র পাঁচপোতা গ্রামের স্ত্রীলোকেরা এই উৎসবে একত্র হয় ইছামতী তীরবর্তী একটি প্রাচীন জিউলি গাছ ও কদম গাছের তলায়। উৎসবে গ্রামের মেয়েরা পাড়া হিসেবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানা জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করে। কিন্তু নিয়ম হয়েছে এখানে রান্না হবে না, খাবার জিনিস নিয়ে আসবে সবাই বাড়ি থেকে। যার যেমন সাধ্য। মেয়েরা এখানে কলার পাতা পেতে তাতে খায়। ছড়াকাটে, গান গায়, উলু দেয়–

> "এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের বৌ, তুমি ভালো জিনিস এনেচ খাবার জন্যে– যারা দারিদ্র্যের জন্য তেমন কিছু আনতে পারেনি, তাদের তুমি ভাগ করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার। এ কেউ বলে দেয় না, কেউ বাধ্যও করে না -এ একটি অলিখিত গ্রাম্য প্রথা বরাবর চলে আসচে এবং সবাই মেনেও এসেচে।"[১০]

এই যে আদান- প্রদানের সামাজিক পরম্পরা, এতে ধনী-দরিদ্রের সামাজিক ব্যবধান বেশ কিছুটা হ্রাস পায়। যেমন, ধনী নালু পালের স্ত্রী তুলসী খাবার ভাগ করে নেয় দরিদ্র যতীনের স্ত্রী ও বোনের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যের সামাজিক ব্যবধানটাও অনেক শিথিল হয় এখানে। তিলু- বিলু খাবার ভাগ করে খায় গ্রামের সব থেকে দরিদ্র স্ত্রী নীলমণি সমাদ্দারের পুত্রবধূর সঙ্গে।

'তেরের পালুনি'তে যে খাদ্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাই আমরা, তা কিন্তু একেবারেই পল্লীবাংলার নিজস্ব খাদ্য তালিকা। চিড়ে, মুড়কি, বাতাসা, কলা, চিনির মঠ, চালভাজা, দইয়ের ঘোল। লোকখাদ্যের এই উৎসবের শেষ দিকে থাকে ছড়া গানের সমাহার। পঞ্চাশোর্ধ বিধুদিদি শোনান ছড়া ও নিধুবাবুর গান। শ্যামাসংগীত গান করে গ্রামের বধু নিস্তারিণী। সবমিলিয়ে গ্রামের নারী সমাজের একটি জীবন্ত সামাজিক দৃশ্য এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হয়ে ফোটে।

অন্যান্য উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজার কথা উপন্যাসে রয়েছে দুই জায়গায়। একটি শিপটন সাহেবের করা নীলকুঠির দুর্গাপুজা এবং অন্যটি নালু পালের করা দুর্গাপূজা। পূজা উপলক্ষে গ্রামে বেশ হৈচৈ লক্ষ করা যায়। শিপটনের পূজায় নীলকুঠিতে বিশাল দুর্গা মূর্তি তৈরি হলো, মনসাপোতা গ্রামের বিশ্বম্ভর ঢুলি এসে টানা তিন দিন ঢোল বাজাল। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো যাত্রাগান। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা শুনতে আশেপাশের সতেরটি গ্রামের লোক জড়ো হয়েছিল।[১১]

তবে এই পুজোর যাত্রা দেখতে মেয়েদের যেতে দেয়নি ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা। অবশ্য তিলু -বিলু বা নালু পালের স্ত্রী তুলসী গিয়েছিল যাত্রা দেখতে।

নালু পালের দুর্গাপূজায় গ্রামীণ দলাদলির এক জীবন্ত চিত্র দেখি। নালু গ্রামের প্রধান প্রধান লোকের কথা অমান্য করে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করল। গ্রামের সমাজপতিরা স্বাজাত্যাভিমানের অহংকারে এই পূজা বয়কট করল, একমাত্র ভবানী বাবু ছাড়া। ভবানীর পরামর্শে নালু পাশের গ্রামের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। এই প্রসঙ্গে আমরা ব্রাহ্মণ ভোজনের দালালের দেখা পাই। একজন রামহরি চক্রবর্তী অন্যজন সাতকড়ি ঘোষাল। এই দালালরা নালু পালের সঙ্গে নিজেরা ৫ টাকা করে চুক্তি করে ব্রাহ্মণ জোগাড়ের দায়িত্ব নেয় ।

> "নালু পালের দিকে ফিরে রামহরি ডান হাতের আঙুলগুলো সব ফাঁক করে তুলে দেখিয়ে বললেন-পাঁচ টাকা করে লাগবে আমাদের দুজনের।
>
> -দোব।

- ব্রাহ্মণ ভোজন-দক্ষিণে দিতি হবে এক টাকা ।
-ওইটে কমিয়ে আট আনা করতি হবে ।
-আরেক মালসা ছাঁদা দিতি হবে– লুচি, চিনি, নারকেল নাড়ু। খাওয়ার আগে ।
-তাও দেবো, কিন্তু দক্ষিণেটা আট আনা করুন।
- আমাদের পাঁচ টাকা করে দিতে হবে খাওয়ার আগে কিন্তু। এর কম হবে না।"[১২]

কালীপূজার আগের দিন চৌদ্দ শাক তোলার নিয়ম। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ইছামতীর তীরে এসেছে শাক তুলতে। খোকা অর্থাৎ টুলুও এসেছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু সে চৌদ্দ শাক চেনেনা। তাদের কথার মাধ্যমে লেখক ধরিয়ে দেন চৌদ্দটি শাকের নাম–" এই দ্যাখ কত শাক, গাঁদামণি, বউ টুনটুনি, গাদানটে, গোয়ালনটে, ক্ষুদে ননী, শান্তি শাক, মটরের শাক, কাঁচড়াদাম, কলমী, পুনর্নবা- এখন তুলব রাঙা আলুর শাক, ছোলার শাক আর পালং শাক– এই চৌদ্দ।"[১৩]

এখানে কয়েকটি মাত্রচিত্রের উল্লেখ করা গেল, কিন্তু এর মাধ্যমেই আমরা বুঝে নিতে পারি যে এই উপন্যাসে এমন সামাজিক চিত্রের অজস্র ছড়াছড়ি। গয়ামেম, প্রসন্ন চক্রবর্তী, রামকানাই কবিরাজ, নীলমণি সমাদ্দার ও তার সংসার চালানোর জন্য কলাকৌশল, নীলকুঠির সঙ্গে সাধারণ লোকের লড়াই, নদীর ঘাটে গ্রামের লোকের স্নানের ছবি– আরো অনেক সামাজিক চিত্র খুব নিপুণ হস্তে, অত্যন্ত যত্নে এঁকেছেন বিভূতিভূষণ। সম্ভবত তাই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় প্রমথ বিশী বলেছেন যে, বিভূতিবাবুর ছোটগল্প ও উপন্যাসের অবলম্বন হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। 'ইছামতী' উপন্যাসে এই কথা খুব বেশি করে চোখে পড়ে।

সৈয়দ আব্দুল মালিক -এর 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' (১৯৬০) উপন্যাসের পটভূমি ধনশিরি নদীর তীরবর্তী ডালিম গ্রাম। এই উপন্যাসে যে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার রূপাঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক, সেটি হলো মুসলমান জনগোষ্ঠী। ধনশিরি নদীর কূলে এই স্থিত ডালিম গ্রামের একটি আপাত দরিদ্র, কিন্তু কঠোর শ্রমে ভাগ্য পরিবর্তন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এক যুবক গুলচ এর জীবন সংগ্রামের কাহিনী নির্মাণ করেছে এই উপন্যাসের আখ্যান।

তবে ডালিম গ্রামের জনবিন্যাসের বেশির ভাগ মুসলমান হলেও সেখানে হিন্দু, নেপালি, মিকির প্রভৃতিও আছে। তারা গরু, মহিষ পালন করে, ধান-সর্ষে-লাউ-মরিচ চাষ করে। দুধ বিক্রি করে। ঈশ্বর এবং আল্লাহ সেখানে পাশাপাশি থাকেন। পুজো পায় পাথর কিংবা গাছও।–

> "পূবে ধনশিরি পছিমে ডালিম। ধনশিরির পছিম পারে ডালিম গাঁও। তিনি কুড়ি দহ মানুহর সর"- পুরণি গাঁওখন। হিন্দু-মুসলমান নেপালী-মিকিরর মিহলি গাঁও। নৈর একেবারে পারত ওঠর ঘর নেপালী, সিঁহতর মহ-গরুর খুঁটি, গরু থকা গোহালি আর মানুহ থকা ঘর। সরিষহ পারে, গোমধান বোয়ে, গাখীর বেচে, জলকীয়া-জাতিলাওর খেতি করে।

সিঁহতর গাতে লগা ছয়ত্রিশ ঘর মুসলমান। দুটা চুবুরিত দুভাগ– ন-ডালিম, পুরণি ডালিম– পিছে ডালিম গাঁও একেখনেই।

ধানখেতি করে, সরিষহ মাটিমাহ, মরাপাট করে, নৈর পূবফালে সিটো পারত পাম খেতি করে, বিয়া পাতে, বরভোজ করে, দন-কাজিয়া করে। মনে মনে থাকে।

তার সিপারে সরহখিনি হিন্দুর পরিয়াল– কছারী আর সূতকুলীয়া মানুহ, এঘর বামুনো আছে। আঠ ঘর মিকির।

ঈশ্বর, আল্লা, শিল আর গছ– দুটা মসজিদ, এটা নামঘর।

ধনশিরিত বান আহিলে বনরীয়া হাতি ওলালে, কারোবার ঘরত জুই লাগিলে, হাইজা-বসন্ত আহিলে, আল্লা-ঈশ্বর একেলগে গাঁওলৈ আহে। তুলসী তলত চাকি জ্বলে, মসজিদত মম জ্বলে, বরগছর তলত সেন্দুরর শিতান লৈ বনরীয়া ফুল টোপনি যায়। অন্য সময়ত আল্লা ঈশ্বর সকলোরে ছুটি।"[১৪]

অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও প্রত্যেকেই স্বনির্ভর। বেশিরভাগ লোকই কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং নিজের বা অন্যের জমিতে চাষ আবাদের কাজ করে। গ্রামের মানুষ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহে বিশ্বাসী। উপন্যাসের নায়ক গুলচ, নায়িকা তারা কিংবা কপাহী সকলকেই দেখা যায় এরকম কঠোর পরিশ্রমের জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এমনকি আপাত সুখী ও আর্থিক নিরাপত্তার জীবনও এরা হেলায় ত্যাগ করে আসে এবং কঠিন পরিশ্রমের জীবন গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়না আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য। গুলচের মায়ের চরিত্র ব্যাখ্যায় দেখি ডালিম গ্রামের মেয়েদের স্বরূপ– "মাক ডালিম গাঁওরে ছোয়ালী। বহি খাব নাজখনে। পাঁচ বছরিয়ার পরা ভুঁই কঠিয়া করি, খরি ফালি, ঢেকী খুন্দি খাইছে। কাম করিবলৈ ভয় নকরে। গাটো ভালে থাকে মানে মাগি নেখাঁও। খাটি খাম।"[১৫]

অর্থনৈতিক দিক থেকে আরেকটি বিষয় বিশেষ করে চোখে পড়ে। তবে আর্থিক দিকের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সামাজিক একটা ব্যাপারও থাকে। ধনশিরি নদী দিয়ে মাঝে মাঝে বড় বড় সওদাগরের নৌকা আসে এই গ্রামে। এই সওদাগরের কাছ থেকে ডালিমবাসীরা নেয় আলু, সর্ষে ও অন্যান্য শস্যের বীজ। কয়েকমাস পরে তারা আবার আসে তাদের পাওনা নিতে। এই সব সওদাগরের ধনের অভাব নেই। এরা কখনও ডালিম গ্রামের মেয়ে-বউ-এর দিকেও হাত বাড়ায়। এতে ডালিমের সমাজ খানিকটা অস্থির হয়ে ওঠে। কপাহীর জীবনেও একজন এরকম ব্যবসায়ী এসেছিল। ফলস্বরূপ তার ও নাহরের দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে যায়। অবশ্য এসব ব্যাপারে প্রথম দিকে গ্রামের সমাজের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। পরে অবশ্য সবাই মিলে কপাহীকে একঘরে করে দেয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসে যে সমাজের কথা আমরা পাই, তা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমাজ। প্রত্যেক জনসমাজের মতো এই অঞ্চলের মানুষেরও কিছু বিশ্বাস আছে, সংস্কার আছে যা ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত। এই ধর্মমতে সব লোকেরই জীবনে অন্তত একবার বিবাহ করা কর্তব্য।[১৬]

চফি বুড়োর এক ছেলে, প্রায় প্রতিবন্ধী বফির বিয়ের ভাবনায় ঔপন্যাসিক সুকৌশলে এই দিকটির ওপর আলোকপাত করেছেন– "গাঁওত খোরা, কণা, লেঙেরা কোনোয়ে বিয়া নকরোয়াকৈ নেথাকে। বিয়া করোয়াটো চুন্নত, অবশ্য পালনীয় ধর্ম। বিয়ার পরিণাম যেই কি নহওক। বিয়া নকরোয়াটো ডাঙর গুণাহর কথা, পাপর কথা।"[১৭]

ডালিম গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই যেহেতু কৃষিজীবী, তাই পুরুষেরা দাড়ি কাটানোর সময় পায় খুব কম। আশ্বিন,কার্তিক, মাঘ- ফাল্গুন-চৈত্র, এই ক মাস সেখানে দাড়ি কাটা হয়। খেতি চলাকালীন অবস্থায় সেখানে দুমাস দাড়ি না কাটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাছাড়া আরেকটি কথা, ডালিমে কোন নাপিত নেই। পাঁচজন দর্জি আছে। কাঁচি আছে তাদের কাছেই। তাদের থেকেই চুরি টুরি করে দু-একজন চুল কাটে, কারণ তারা কাপড় কাটে যে কাঁচি দিয়ে, তা দিয়ে চুল কাটতে দেয় না। তবে গ্রামের প্রায় প্রত্যেক যুবক চুল কাটতে জানে। এক ঘর থেকে কেঁচি, এক ঘর থেকে চিরুনি, এক ঘর থেকে খুর, আর কোন একজনের ঘরের উঠোনে বসে চুল কাটা হয়। যারা ভালো করে চুল কাটতে পারে তাদের বেশ খাতির।

উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান সমাজের পারস্পরিক সহাবস্থান খুব গুরুত্ব সহকারে দেখানো হয়েছে। সাধারণত ইসলাম ধর্মীয় লোক ধর্ম ব্যাপারে খুবই নিয়মনিষ্ঠ ও ধর্মভীরু। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা সাধারণত তারা করে না। কিন্তু অসমিয়া মুসলমানদের ধন ভাবনা সম্পর্কে বেশ কয়েক জায়গায়, উপন্যাসে, হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছ। যেমন 'সঁচ নিদিবা, সঁচ গল মানে লখিমী গল' (পৃঃ,৩৮), 'কপাহী আর তারার লগে লগে গুলচর ঘরলৈ লখিমী আহিল।' (পৃঃ, ১১০) ইত্যাদি। অসমিয়া সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস এই অঞ্চলের লোকেদের ভেতর সমানভাবে বহমান। তামোল-পাণ বা জলকুঁয়রী প্রসঙ্গের উল্লেখে এর প্রমাণ মেলে। গুলচের ধর্ম ইসলাম হলেও ধর্মীয় রীতি-নীতি সম্পর্কে সে প্রায় উদাসীন।

> "তার আগরটো শুকুরবারে বহুত ভাবিচিন্তি আর রাতিপুয়ার পরা সাজিকাচি গুলচ জুমা নামাজ পঢ়িবলৈ পিরীয়া গাঁওর মসজিদলৈ গ'ল। নামাজর সকলোবোর নীতি নিয়ম সি নেজানে। তথাপি কেতিয়াবা ইদে বকরিদে সি মসজিদলৈ গৈ জামাতর লগত উঠাবহা করে। অবশ্যে আজি তিনি বছর সি ইদর নামাজর বাহিরে অন্য নামাজ পঢ়া নাই। তার মনতেই নপরে।"[১৮]

গুলচের জীবনে ধর্মের চেয়ে কর্মের গুরুত্বই বেশি মনে হয়। এবং এই কর্মে তার ফ্রেন্ড ফিলোসফার ও গাইড চন্দ্র। চন্দ্র এবং ভীম হিন্দু হয়েও গুলচের উপকার করেছে। ফলে এখান থেকে গ্রামীণ জীবনে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সহাবস্থানের সজীব চিত্র লাভ করা যায়।

কৃষিক্ষেত্রে হরিণ, পাখি বা হাতির উৎপাত অসমের গ্রাম সমাজের নিয়মিত ঘটনা। এদের অত্যাচারে পরিপূর্ণ ধানক্ষেত নিমিষে ধ্বংস হয়ে যায়। সেইজন্য গ্রামের লোকেরা এই পশুপাখিদের ভীষণ ভয় করে। সবচেয়ে বেশি ভয় করে হাতিকে। কারণ হাতি শুধু ধান খায় না, পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে

দেয়। উপন্যাসে নায়ক গুলচেরও দেখি এরকম ভয়। তার সাধের কৃষি হাতি যদি এক দিক থেকে মাড়িয়ে নষ্ট করে দেয়, তাহলে তার অনেক ক্ষতি হবে, এমন ভাবনায় সে ভাবিত। (পৃঃ,৫৪)

অসমিয়া গ্রাম্য পোশাক-পরিচ্ছদ বা বস্ত্র সম্পর্কে বেশ কিছু কথা উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। অসমিয়া জনজীবনে পাট, তাঁত, মুগা, এড়ি প্রভৃতির তৈরি কাপড় প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে তাঁতের প্রচলন দেখা যায়। ঘরের তাঁতশালে লোকেরা নিজের পরিধেয় বস্ত্র বোনা ছাড়াও কিছু বিক্রয়যোগ্য কাপড় তৈরি করে। অসমের নারীরা নিজের বোনা এইসব কাপড়ে সুন্দর নকশা এঁকে থাকেন– "খেতির পরা উঠি দুয়োজনীয়ে তাঁত লগালে, কপাহীয়ে লগাইছে বর কাপোর, তরাই লগাইছে রিহা। তরাই বছা চরাইখনীয়া ফুল অন্য শিপিনীর ঈর্ষার বস্তু। ....তাইর কাম বর মিহি। ক'তো আঁর নাই, খুঁত নাই।"[১৯]

অসমের বস্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনায় গামছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। গামছা ছাড়া অসমের যেকোন বস্ত্রালোচনা অসম্পূর্ণ। আলোচ্য উপন্যাসে আমরা অনেকবার গামছা প্রসঙ্গ পাই। তারার গা ঢাকা ওড়না রূপে গামছা ব্যবহৃত হয়েছে। (পৃঃ, ৫৬)। গুলচের সঙ্গেও সর্বদা গামছা থাকে। তার নতুন পোশাকের অভাব থাকলেও চিন্তা নেই। কেননা গ্রামে বেড়াতে গেলে ভালো পোশাক দরকার নেই, গামছাই যথেষ্ট।

সামাজিক রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বিবাহ। বিভিন্ন সমাজে অনুষ্ঠিত হওয়া বিয়ের বিভিন্ন রীতি নীতি থেকে সেই সমাজ সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা সম্ভব। সমাজজীবন নির্ভর উপন্যাসেও বিবাহ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। আলোচ্য উপন্যাসে বেশ কয়েকবার ডালিম গ্রামের সামাজিক বিয়ের রীতি আলোচিত হয়েছে। এই গ্রামে ছেলে মেয়ের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাকে অনৈতিক ধরা হয় না। বিশেষত ছেলে এবং মেয়ে যদি রাজি থাকে তবে কেউ বিশেষ আপত্তি করে না। কিন্তু গুলচ ও চেনিমাই এর বিয়ে হলো না পালিয়ে গিয়েও। আপত্তি করল দুই পক্ষের অভিভাবক। আর যেহেতু তখনও মৌলবী এসে নিকাহ পড়েনি, তাই এই বিয়ে হতে পারল না। ফলে দেখি পরবর্তীতে বিয়ে প্রসঙ্গে যখন চন্দ্রের পরামর্শ চেয়েছে, তখন চন্দ্র তাকে প্রথম থেকেই আটঘাট বেঁধে চলতে পরামর্শ দেয়। চন্দ্রের এই পরামর্শ গুলচ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল কপাহীর সঙ্গে তার বিয়ের (নিকাহ) সময়। মৌলবী সময় মতো এলো। যদিও পালিয়ে বিয়ে তবু চন্দ্রের মতে এটা বিয়েই। তাই সমাজের সমর্থন থাকলে এই বিয়েতে কেউ বাধা দিতে পারবে না । পাত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলবী নিকাহ পড়িয়ে দেবে। পাত্রীকে সহায় করবে চেনিমাই। চন্দ্র মৌলবীকে বুঝিয়ে রাখল পাত্রী এলেই অনুষ্ঠান সেরে ফেলতে। সেইমতো মৌলবী নিজের কাজ করলে, "কপাহী গৈ বহার লগে লগে মৌলবী আহিল। তিখর আরো গারোয়ানটো নিকাহর সাক্ষী থাকিল। মৌলবীয়েই উকিলো হ'ল –খুৎবাও পড়িলে। দরার নাম কি, ছোয়ালির নাম কি, সেই বিষয়ে কারো বিশেষ মনোযোগ দিবলগিয়া নাছিল, মোহরানাও মৌলবীয়েই ঠিক করি ললে-পঞ্চাশ টকা।"[২০]

ডালিমের সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল গ্রামের আয়োজিত ভোজ। বছরে গ্রামে দুটি বড় ভোজ হয়। একটি বৈশাখের মাঝামাঝি বা জ্যৈষ্ঠের শুরুতে খেতির আয়োজনের সময়। আরেকটি মাঘ মাসে ধান কাটার পর। দুটি ভোজকেই ডালিমের অধিবাসীরা বড় পবিত্র বলে মনে করে। অনেকে রোগ থেকে আরোগ্য হতে বা অন্য কোনো মনস্কামনা পূরণ হবার আশায় এই ভোজে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে থাকে।

ভোজের দিন কারো অন্য কোন কাজ থাকেনা। সবাই ঘরদোর লেপে কাপড় কেচে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ঘরে ঘরে পিঠাপুলি তৈরির জন্য চালের গুঁড়ো হয় এবং পিঠে বানানো হয়। মসজিদে সার্বজনীনভাবে এক জায়গায় মাংসের তরকারি রান্না করা হয়। বিকেলে ছেলে মেয়ে (নাবালিকা মেয়ে) নিয়ে গ্রামের লোকেরা মসজিদে যায় । মসজিদের বারান্দায় সারি পেতে বসে, হিসাব করে নিজের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের জন্য একটা দুটো পিঠা রেখে বাকি পিঠা সাধারণের জন্য রাখা টুকরিতে জমা করে। একজন লোক এসে প্রত্যেকের পাতে কাতারে মাংস দিয়ে যায়। আসলে ভোজের সার্বজনীন জিনিস এই মাংসের তরকারিটুকুই। সাধারণ লোক শুধু একটু খেয়ে পিঠা অনুসারে নিজের নিজের ভাগটুকু নিয়ে ঘরে যায়। এই ভাগের অংশও মেলে সামাজিক পদমর্যাদা অনুসারে। মোল্লা, গাওঁবুঢ়া বা সরদারের ভাগ বেশি। এই মসজিদের জন্য যাকে তাকে দিয়ে পিঠে পুলি তৈরি করা চলে না। কারণে এ কাজ পুণ্যের। তারার ভাবনায় এই ধরনের কথা জানা যায়। (পৃঃ, ৮৪)

যে অঞ্চলের কথা এই উপন্যাসে বলা হয়েছে সেখানে গ্রাম্য ওঝার দেখাও পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রাম জীবনেরই বৈশিষ্ট্য যে, গ্রামীণ গুণিন, বৈদ্য, ওঝা, আচার্য বা গণক ঠাকুরের এখানে ছড়াছড়ি। তারা রোগের চিকিৎসা থেকে শুরু করে ভাগ্য পরীক্ষা করে, এমনকি ভূতও তাড়ায়। এই উপন্যাসেও এরকম লোক দেখা যায়। এখানে ওঝার নাম বাহাদুর। সে রোগের চিকিৎসা করে, ভূত তাড়ায়, লোকের মঙ্গলামঙ্গল দেখে দেয়, হারিয়ে যাওয়া বস্তুর সন্ধান দেয় এবং হস্তরেখা দেখে ভাগ্যের কথা বলে। (পৃঃ, ৭০)

শিক্ষার পরশ প্রায় না পাওয়া একটি গ্রামে লোকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে থাকবে, এতে আশ্চর্য কি! কিন্তু এমন সমাজেই পরিবর্তনের কথা শোনা যায় চন্দ্রের মুখে। সে নদীবাঁধের কথা বলে, স্ত্রী শিক্ষার কথা বলে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-থানার কথা বলে আর গ্রামের লোক হা করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ঘর, দরিদ্রদের কুটির প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র রয়েছে এই উপন্যাসে। মোটামুটি বলা যায় যে, সৈয়দ আব্দুল মালিক তাঁর এই উপন্যাসে অসমের গ্রামীণ জীবনের বেশ কিছু দিককে যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, গ্রাম, নদী, ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যে আলোচ্য দুটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। উপন্যাসগুলো যদি পাশাপাশি রেখে অধ্যয়ন করা যায়, তবে সেগুলোতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি খানিকটা তুলনার পরিসরের জায়গাও তৈরি হয়। দুটি

পৃথক আঞ্চলিক অবস্থানের পটভূমিকায় রচিত সাহিত্যকৃতির মধ্যে কিছু মিল ও কিছু পার্থক্য থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক। বাংলা এবং অসমিয়া গ্রামভিত্তিক জনজীবনে প্রকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষদের জীবন ধারণের পদ্ধতি, সমসাময়িক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কালচেতনা– এগুলো এগিয়ে চলে প্রকৃতির সঙ্গে যা আমরা দুটি উপন্যাসেই দেখি।

বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মনকে দেখেছেন। মানুষের জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। সমালোচক 'ইছামতী'তে ভবানীর দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যের রহস্য এই প্রকৃতিতে মজে থাকাতেই রয়েছে বলে উপলব্ধি করেছেন।[২১]

অন্যদিকে, মালিক- এর প্রকৃতি চেতনা নিঃসন্দেহে তার মর্তপ্রীতির প্রকাশ। তার চরিত্র সহজ সরল জীবনে প্রকৃতির আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতির শান্ত সমাহিত রূপের বর্ণনা আছে কিন্তু মালিকের উপন্যাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে ধ্বংসকারী রূপ প্রকাশ পেয়েছে যা আমরা বন্যার প্রলয়ঙ্করী রূপের মধ্যদিয়ে দেখতে পাই।

তুলনার আলোকে দুটি উপন্যাসকে বিচার করলে আমরা নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যেমন,

১. ইছামতী উপন্যাসে যে গ্রামীণ সমাজের কথা বলা হয়েছে, তা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সমাজ নয় এই গ্রামে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, নানা জাত এবং নানা ধর্মের লোক দেখা যায়। এমনকি ইংরেজ সাহেবের কথাও এখানে রয়েছে। এই ধরনের অঞ্চলভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে সাধারণত একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়ে থাকে। প্রথম থেকেই বিভূতিভূষণ সে প্রয়াস করেননি। এখানে যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ রাজারাম কিংবা ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, তেমনি ভয়ঙ্কর ডাকাত হলা পেকেও রয়েছে। ব্যবসায়ী লালমোহন পাল যেমন আছে, তেমনি নিঃস্ব রামকানাই কবিরাজের সন্ধানও আমরা পাই। তিলুর মতো স্বামী সোহাগিনী স্ত্রী যেমন আছে, তেমনি নিস্তারিণীর মতো অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত সাহসী নারীও দেখা যায়। সমালোচক রুশতি সেন যার সম্পর্কে বলেছেন, "নিস্তারিণীর উপমা মেলেনা সতীত্বের নির্দিষ্ট ছকে শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি ষষ্ঠ আনুগত্যে।"[২২]

অতএব আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর কথা বলা এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হয়েছে চিরাচরিত প্রবহমান মানবজীবনের স্বরূপকে প্রকাশ করা।

অন্যদিকে মালিকের উপন্যাসে মুখ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে ইসলাম ধর্মীয় লোকসমাজের কথা আলোচিত হলেও ডালিম গ্রামে অমুসলমানদের সংখ্যাও প্রায় সমান। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব এখানকার বৈশিষ্ট্য। চন্দ্র হিন্দু হলেও কপাহী বা গুলচের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাহ্যিক নয়, আন্তরিক। গুলচের বিবাহের উদ্যোগে তার এই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রামের বেশিরভাগ লোকই কৃষিজীবী। জমির অভাব নেই, কেননা নদীর কৃপায় প্রত্যেকটি পতিত

জমিই উর্বর। অতএব উদ্যোগী হলেই সেই মাটিতে কৃষি কাজ করা যেতে পারে। গ্রামের পাশেই জঙ্গল থাকার জন্য এখানকার লোকেদের কখনো বাঁশ কাঠ প্রভৃতির জন্য পরনির্ভরশীল থাকতে হয় না।

ইছামতীর তীরের সমাজে আমরা যেমন এক ধরনের স্থবিরতা, শান্ত, নিশ্চল, কর্মবিমুখ সমাজ প্রবাহ দেখতে পাই, তার বিপরীতে তেমনি ধনশিরি নদীর তীরবর্তী গ্রামে আমরা কর্মপটু, তৎপর, উদ্যোগী, কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী সমাজের সঙ্গে পরিচিত হই। দুই সমাজের এই আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য খুব মন দিয়ে দেখলে নজর এড়িয়ে যায় না।

২. ইছামতী উপন্যাসের দ্বিতীয় যে জিনিসটি সহজেই পাঠককে আকর্ষণ করে তা হলো ঔপন্যাসিকের প্রকৃতি প্রেম। বাংলার গ্রাম প্রকৃতি তার সমস্ত রূপ-লাবণ্য নিয়ে যেন এই উপন্যাসে উপস্থিত। ইছামতির তীরে পাঁচপোতা গ্রামে বাওড়ের ধারে গ্রান্ট সাহেবের ভ্রমণের দৃশ্য, অথবা নদীর জলে নিস্তারিণীর স্নান করার দৃশ্যের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, সেখানে আমরা গ্রাম বাংলার চিরন্তন রূপকেই পাই। নানা রকম গাছ যেমন বাঁশ, নিম, সোঁদাল, বৈঁচি প্রভৃতি; পাখি যেমন শালিক, দোয়েল, ছাতারে, বউ কথা কও প্রভৃতি; ফুল যেমন ধুন্দুলের ফুল, রাধা লতার ফুল, কেয়া, বিল্বপুষ্প, আমের বোল, নাটা-কাটার ফুল ইত্যাদি। এমন অজস্র গাছ, ফুল, পাখি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ, যেগুলি একান্তভাবেই গ্রাম বাংলার নিজস্ব পরিচিতি।

সমালোচক নগেন শইকীয়া যদিও বলেছেন যে 'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসের মূলসুর 'মানবীয় প্রেম'[২৩] তবু এখানে ঔপন্যাসিকের প্রকৃতি প্রেম এই উপন্যাসে একটা স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। নায়ক এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পাওয়া এই প্রকৃতি প্রীতি আসলে লেখকেরই প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার নামান্তর মাত্র। পরিষ্কার নদীর প্রায় নীল জলে যখন বৃষ্টি ঝরে পড়ে, তখন নদীর একটি অপরূপ রূপ গুলচের চোখে ধরা পড়েছে। গুলচ অনুভব করে যে, একটা চমৎকার মিষ্টি শব্দ জন্ম নিচ্ছে যে শব্দের সঙ্গে গাছে পড়া বৃষ্টির জলের শব্দের কোনো মিল নেই। কিংবা যখন ঝোপের মধ্যে বুনোফুলের সুগন্ধ গুলচের নাকে এসে লাগে তখন তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তার অতীতের দিনগুলি। সেই গন্ধ তাকে নস্টালজিক করে তোলে।

সন্দেহ নেই প্রকৃতির বর্ণনায় বিভূতিভূষণ মালিকের তুলনায় অধিকতর সাবলীল। বাংলার তুচ্ছাতিতুচ্ছ নদী, মাঠ, ফুল, পাখি, গাছপালা সমস্ত কিছুকে বিভূতিভূষণ মমতার সঙ্গে নিজের সাহিত্যে জায়গা দিয়েছেন। তাকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পরিবেশন করেছেন। পক্ষান্তরে মালিকের রচনায় আমরা এমনটা দেখি না। তার প্রকৃতি প্রীতিও অনেকটা মানবিক বাস্তববোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ।

৩. বাংলার চিরাচরিত ব্রত-পার্বণ, পূজা, ধর্মচর্চা প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ 'ইছামতী' উপন্যাসে রয়েছে। দুর্গাপূজা, তীর্থযাত্রা, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রসঙ্গ যেমন দেখা যায়,

তেমনি মেয়েদের একান্তই নিজস্ব উৎসব 'তেরের পালুনি' ব্রতের কথা এখানে আমরা দেখি। বঙ্গদেশের গ্রামীণ সমাজের চিরাচরিত বিভেদ, দলাদলি, জাতপাত প্রভৃতিও এই উপন্যাসে সজীব। প্রসঙ্গত নালু পালের দেওয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে মুখ্যত ইসলাম ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কথাই 'সূরুযমুখীর স্বপ্নে' বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মীয় লোকের কথা বলা হলেও গ্রামে অন্যান্য ধর্মের লোকজন বর্তমান এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান ও প্রীতির বন্ধন অত্যন্ত মজবুত। 'ইছামতী' উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের পাশাপাশি এখানে এই পারস্পরিক মেলবন্ধন উল্লেখযোগ্যভাবে নজরে পড়ে। গুলচের বিয়ের জন্য চন্দ্রের যে উদ্যোগ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তা আমাদের এই পারস্পরিক মেলবন্ধনের দিকটি নির্দেশ করে। এই উপন্যাসেও সামাজিক ভোজের কথা আছে এবং এই প্রসঙ্গে 'ইছামতী' উপন্যাসের ভেদাভেদের চিত্রের বিপরীতে এখানে বরং একটা সামুহিক সর্বসাধারণের যোগদানের চিত্র নজরে পড়ে ।

৪. অর্থনৈতিক দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায় যে, দুটো উপন্যাসেই মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলা হয়েছে। 'ইছামতী' উপন্যাসে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সেটা ঔপনিবেশিক যুগ। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মূলত ইংরেজদের হাতে। ওই সময় বাংলার গ্রাম অঞ্চলের প্রায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া কৃষি ব্যবস্থা, উদ্যোগহীন বেকার গ্রামীণ সমাজের চিত্র বিভূতিভূষণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, যেমন রেলগাড়ি প্রবর্তন, প্রভৃতির কথাও এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বিভূতিভূষণ কিছু কিছু জায়গায় জমিদারি প্রথার উল্লেখ করেছেন। জমিদারি প্রথায় জমিদারের শোষণ এবং অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র আছে। বিস্তারিতভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত তেমনভাবে না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি যে আসলে বাংলার গ্রামসমাজ তখন কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল। তবে কঠোর পরিশ্রমী যুবক যে নিজস্ব উদ্যোগে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবসার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে, নালু পালের গল্পে সে কথা প্রমাণ হয়।

'সূরুযমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসেও যে অর্থনীতির চিত্র আমরা পাই তা মূলত কৃষিনির্ভর। পাশাপাশি গো-পালন, তাঁত বোনা প্রভৃতি কিছু বৃত্তির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। তবে মূলত ধান চাষ, পাট চাষ, বুনো জমি চাষের উপযোগী করে চাষ করা প্রভৃতি প্রসঙ্গে কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে এক কর্মযোগী বেকার যুবক গুলচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বুনো জমিকে চাষের উপযোগী করে চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে বন্যার ফলে সৃষ্টি হওয়া জমিতে পলি পড়ে চাষের উপযোগী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিছু কিছু ব্যবসায়ীর কথা রয়েছে তারাও কিন্তু কৃষির বীজের ব্যবসা করে। ফলে কৃষিভিত্তিক ব্যবসার চিত্রও এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।

৫. 'ইছামতী' উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যশোর অঞ্চলের উপভাষার সার্থক প্রয়োগে এখানকার চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জীবন্ত। এছাড়া ইংরেজদের চরিত্রে ইংরেজি

মিশ্রিত ভাঙা বাংলা উচ্চারণ বাস্তবোচিত হয়েছে। যেমন :

ক) ইংরেজ এর উক্তি : "কটো জমি এ বছর ভাগ দিয়াছ, আমাকে কাল ডেখাতে হইবে। ইম্প্রেশন রেজিস্টার তৈরি করিয়াছ?"

খ) "তিনকড়ি বিদায় নেবার উদ্যোগ করতেই রাজারাম বললেন ব্রাহ্মণ বাড়ি এসেচ, পেরসাদ না পেয়ে যাবে, না যেতি আছে? পয়সা হয়েছে বলে কি ধরাকে সরা দেখচো নাকি?"

'সূরুযমুখীর স্বপ্নে'র মধ্যেও আমরা অসমিয়া লোকভাষার বহুল প্রয়োগ লক্ষ করি। উপন্যাসটি যদিও বর্ণনাত্মক ভাবে লেখা, তাও মাঝেমাঝেই স্থানীয় ভাষার প্রয়োগ করেছেন লেখক। যেমন-

"রাতি গ'ল রাতিপুয়া ঘুরাই আনিলু। লরা, ফুকুয়া নাই নহয়।" (পৃঃ, ৬০)

তাছাড়া মুসলমান জনসমাজের ব্যবহৃত কথ্যভাষাও এখানে উল্লেখিত হয়েছে বিশেষত ইসলাম ধর্মীয় কিছু শব্দের বারবারই দেখা পাওয়া যায় যেমন– ছায়াব, মসজিদ, জুম্মা, নামাজ, চিন্নী, কারবালা ইত্যাদি।

৬. বিভূতিভূষণ ও মালিকের উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণের তুলনামূলক বিচারে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এই দুজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের চরিত্র সামাজিক বাস্তব পটভূমিতে গড়ে ওঠা সংবেদনশীল মানুষ। বিভূতিভূষণ সামাজিক আবেষ্টনী এবং পরিবর্তনের প্রক্রিয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনের প্রতিকূল বলে মনে করতেন। তাই এই স্বাভাবিক দিকটিকে চিত্রিত করতে তিনি তাঁর পরিচিত প্রকৃতির পটভূমিতে সহজ-সরল গ্রাম্য জীবনকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁর ভবানীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। সে বন্ধন-ভীরু পথিক, সকল প্রকার বন্ধনের প্রতি তার এক ভীতি।

অন্যদিকে মালিকের উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম্যজীবন যদিও, তাঁর চরিত্রগুলো প্রকৃতির চেয়ে সমাজের সঙ্গে অধিকতর জড়িত। সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের সংঘাতের ফলে উদ্ভব হওয়া সমস্যা-সংকট, দুঃখের অনুভূতি তাঁর চরিত্রগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়। মালিকের গুলচ সংসার বিরাগী নয়, সংসারের বন্ধন সে উপভোগ করে।

বিভূতিভূষণের নারী চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের স্নিগ্ধ মাতৃত্ব। স্নেহপরায়ণতাই বিভূতিভূষণের নারীচরিত্রসমূহের মূল উপাদান। সরল, মমতাময়ী, সংসারী, দ্বন্দ্বহীনা এবং একনিষ্ঠা বাংলাদেশের কন্যা বিভূতিভূষণের উপন্যাসের নায়িকা। কিন্তু সৈয়দ আব্দুল মালিক এর উপন্যাসে বিচিত্র নারী চরিত্রই আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐশ্বর্যময়ী, প্রতিহিংসাপরায়ণা, প্রবঞ্চিতা, ছলনাময়ী, প্রেমিকা এমনকি বিপথগামী নারীর জীবনের চিত্রও তাঁর উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়াও মায়ের চরিত্রও মালিকের উপন্যাসে কখনো দায়িত্বহীন এবং কখনো সম্পর্কে অবৈধ। মালিকের নারীচরিত্রে মনের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্যাও দেখা যায়, যা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে অনুপস্থিত।

বিভূতিভূষণ সবকিছুকেই অন্তর্দৃষ্টি মিশিয়ে দেখেন তাই তিনি বাস্তবের মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্যটি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে চরিত্র চিত্রণের দিক থেকে মালিকের চরিত্র অধিকতর বাস্তবের পটভূমিতে নির্মিত।

উপসংহার

মানবজীবনের শাশ্বত দিকগুলোর কথা যদি স্মরণ করা যায়, তবে সহজেই বলা সম্ভব যে, দুটো অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা দুই জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে ভিন্নতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভিন্নতাই শেষ কথা নয়। অঞ্চলভেদে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, আর্থসামাজিক অবস্থান, সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা এই সমস্ত মানবিক বৃত্তি, দুর্বলের প্রতি সবলের শোষণ, সামাজিক বৈষম্য, পুরুষ নারীর ভেদাভেদ এ সমস্তই চিরন্তন সত্য এবং এগুলোই সাহিত্যের সামগ্রী। আলোচ্য উপন্যাসগুলো এই দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করি যা দেশ কাল ভেদে মানবতার সামগ্রী। পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠী যে আসলে এক মানবতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, এ কথা যেন তারই ইঙ্গিতবাহী। আর এখানেই তুলনামূলক আলোচনার সার্থকতা। বিভূতিভূষণ ও মালিকের উপন্যাসের আলোচনার প্রান্তে এসে একথা বলা চলে যে দুটো উপন্যাসই মানবজীবনের চিরন্তন সত্য প্রকাশ করেছে এবং এখানেই তাঁরা সার্থক হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকারী ।

তথ্যসূত্র

১. *স্মৃতির রেখা*, *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯৪, মিত্র ও ঘোষ কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪১৯

২. *উৎকর্ণ*, *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড, ৫ম পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯৮, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৪৯

৩. *হে অরণ্য কথা কও*, *বিভূতিভূষণ রচনাবলী* সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৩, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা পৃষ্ঠা ৪৭৫

৪. মহীতোষ বিশ্বাস, *বাংলা উপন্যাস : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা*, প্রথম সংস্করণ ১৪০৯, জয় দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১৪

৫. *ইছামতী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৫

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১১২

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ১০৩

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৫

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৬

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪১

১৪. *সূরুযমুখীর স্বপ্ন*, পৃষ্ঠা ২-৩

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১১
১৬. স্বামীম নাসরিন, *সূরুযমুখীর স্বপ্ন বিচার*, পৃষ্ঠা ৮২
১৭. *সূরুযমুখীর স্বপ্ন*, পৃষ্ঠা ৩৫
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১১০
২০. তদেব, পৃষ্ঠা ৯২
২১. ইন্দ্রানী ঘোষাল, *বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস*, পৃষ্ঠা ৭৭
২২. রুশতি সেন, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, পৃষ্ঠা ১১৪
২৩. নগেন ঠাকুর, (সম্পা:) *এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাসর গতি প্রকৃতি, এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস*, পৃষ্ঠা ১৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইছামতী*, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
২. *উৎকর্ণ*, বিভূতিভূষণ রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, ৫ম পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯৮, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
৩. নগেন ঠাকুর, (সম্পা:) *এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস*, ১ম সং, নভেম্বর ২০০২, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটি
৪. মহীতোষ বিশ্বাস, *বাংলা উপন্যাস : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা*, প্রথম সংস্করণ ১৪০৯, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা
৫. ইন্দ্রানী ঘোষাল, *বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস*, প্রথম প্রকাশ ২০০৪ গ্রন্থন প্রকাশনী, কলকাতা
৬. রুশতি সেন, *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, আগস্ট ১৯৯৮, প্যাপিরাস, কলকাতা
৭. *হে অরণ্য কথা কও*, বিভূতিভূষণ রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯৩, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
৮. স্বামীম নাসরিন, *সূরুযমুখীর স্বপ্ন বিচার*, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৭, সূরুযমুখী প্রকাশন, যোরহাট
৯. সৈয়দ আব্দুল মালিক, *সুরুযমুখীর স্বপ্ন*, নতুন সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, গুয়াহাটি
১০. *স্মৃতির রেখা*, বিভূতিভূষণ রচনাবলী প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯৪, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা